Chacha Kahini by Syed Mujtoba Ali

suman_ahm@yahoo.com

চাচা কাহিনী

সৈয়দ মুজতবা আলী

তীর্থহীনা

ভারতবর্ষের লোক এককালে লেখাপড়া শেখবার জন্য যেত কাশী তক্ষশিলা। মুসলমান আমলেও কাশী-মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নি, ছাত্রের অভাবও হয় নি। তবে সঙ্গে সঙ্গে আরবী-ফারসী শিক্ষারও দুটি কেন্দ্র দেওবন্দ আর রামপুরে গড়ে উঠল। ইংরেজ আমলে সব কটাই নাকচ হয়ে গিয়ে শিক্ষা-দীক্ষার মক্কা-মদিনা হয়ে দাঁড়াল অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজ। ভটচায-মৌলবী কোন্ দুঃখে কাশী-দেওবন্দ উপেক্ষা করে ছেলে—এমন কি মেয়েদেরও—বিলেত পাঠাতে আরম্ভ করলেন তার আলোচনা করে আজ আর লাভ নেই।

কিন্তু ১৯২১-এর অসহযোগ আন্দোলনের ফলে উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করল। 'অসহযোগী' ছাত্রদের কেউ কেউ বিলেতে না গিয়ে গেল বার্লিন। এদের সংখ্যা বেড়ে বেড়ে শেষটায় ১৯২৯-এ এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যার উপর ভর করে একটা রেস্তোরাঁ চালান সম্ভবপর হয়ে উঠল। তাই বার্লিনে 'হিন্দুস্থান হৌসে'র পত্তন।

সেদিন 'হিন্দুস্থান হৌসে'র আড্ডা ভালো করে জমছিল না। কোত্থেকে এক পাদ্রীসায়েব এসে হাজির। খোদায় মালুম কে তাকে বলেছে, এখানে একগাদা হিদেন ঝামেলা লাগায়।প্রভু খ্রীষ্টের সুসমাচার শুনতে না শুনতেই এরা ঝাঁকে ঝাঁকে প্রভুর স্মরণ নেবে ও সুবে বার্লিনিস্থানে পাদ্রীসায়েবের জয়জয়কার পড়ে যাবে। অবশ্যি তাঁর ভুল ভাঙতে খুব বেশী সময় লাগে নি। গোঁসাই সঙ্গীতরসজ্ঞ, আর এ-দুনিয়ার তাবৎ সঙ্গীতই গড়ে উঠেছে ধর্মকে কেন্দ্র করে। কাজেই ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তিনি ধর্মবাবদে খানিকটা ওকিবহাল। বললেন, 'সায়েব, খ্রীষ্টধর্ম যে উত্তম ধর্ম তাতে আর কি সন্দেহ কিন্তু আমাদের কাছে তো শুধু এই ধর্মটাই ভোট চাইছে না, হিন্দু মুসলমান আরো দুটো ডাঙর কেণ্ডিডেট রয়েছে যে। গীতা পড়েছ?'

তখন দেখা গেল পাদ্রী কুরান পড়ে নি, গীতার নাম শোনে নি, আর ত্রিপিটক উচ্চারণ করতে গিয়ে তিনবার হোঁচট খেল।

ঘণ্টাখানেক তর্কাতর্কি চলেছিল। ততক্ষণে ওয়েট্রেস পাশের একটা বড় টেবিলে

Sumanahm@yahoo.com

আড্ডার ডাল-ভাত-চচ্চড়ি সাজিয়ে ফেলেছে। চাচা পাদ্রীকে দাওয়াত করলেন হিদেন্ খানা চোখে দেখতে। সায়েব বিজাতীয় আহারের দিকে একটিবার নজর বুলিয়েই অনেক ধন্যবাদ দিয়ে কেটে পড়ল।

চাচা বললেন, 'দেখলি, অচেনা রান্না পরখ করে দেখবার কৌতূহল যার নেই সে যাবে অজানা ধর্মের সন্ধানে। গোঁসাই, তুমি বৃথাই শক্তিব্যয় করছিলে।'

সুয্যি রায় মাস্টার্ড পেতলে নিয়ে কাসুন্দীর মত করে লুচির সঙ্গে খেতে খেতে বললেন, 'ব্যাটা গ্যোটেও পড়ে নি নিশ্চয়। গ্যোটে বলেছেন, যে বিদেশ যায় নি সে কখন স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পায়নি। ধর্মের বেলায় তাই।'

চাচা বললেন, 'কিন্তু অনেক কঠিন। ধর্মের গতি সূক্ষ্ম, কিন্তু বিদেশে যাওয়ার জন্য স্থূল ট্রেন রয়েছে, স্থূলতর জাহাজ রয়েছে, আর টমাস কুক্‌রা তো আছেই। বিদেশে নিয়ে যাবার জন্য ওরাই সবচেয়ে বড় আড়কাঠি অর্থাৎ মিশনরি। আর এতই পাক্কা মিশনরি যে ওরা সক্কলের পকেটে হাত বুলিয়ে দু'পয়সা কামায়ও বটে। কিন্তু ধর্মের মিশনরিদের হ'ল সব চেয়ে বড় দেউলে প্রতিষ্ঠান।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার বলল, 'কিন্তু কি দরকার বাওয়া এসব বখেড়ার? বার্লিন শহরটা তো ধর্ম বাদ দিয়েও দিব্যি চলছে।'

চাচা বললেন, 'বাদ দিতে চাইলেই তো আর বাদ দেওয়া যায় না। শোন।

আমি যখন রাইনল্যাণ্ডের গোডেস্‌বের্গ শহরে ছিলুম তখন ক্যাথলিক ধর্মের সঙ্গে আমার অল্প পরিচয় হতে আরম্ভ হ'ল। না হয়ে উপায়ও নেই। বার্লিনের হৈ-হুল্লোড় গির্জেগুলোকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছে আর রাইনল্যাণ্ডের গির্জার সঙ্গীত তামাম দেশটাকে বন্যায় ভাসিয়ে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

'দাঁড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী
উৎসুক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি
দুয়েকটি তান—'

এ তো তাও নয়। এখানে সমস্ত দেশব্যাপী সঙ্গীতবন্যা আর তার মাঝখানে আমি ক্যাথলিক নই বলে শাখামৃগের মত একটা গাছের ডগায় আঁকড়ে ধরে বসে প্রাণ বাঁচাব এ ব্যবস্থা আমার কিছুতেই মনঃপুত হল না,—তার চাইতে বাউলের উপদেশই ভালো, 'যে জন ডুবলো সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

সমস্ত সপ্তাহের অফুরন্ত কাজ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, বার্লিনের লোক খানিকটা ঠাণ্ডা করে সারা রবির সকাল ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। কিন্তু রাইনের জীবন বিলম্বিত একতালে। তাই রবির সকাল রাইনের দ্রষ্টব্য বস্তু।

কাচ্চা-বাচ্চারা চলেছে রঙ-বেরঙের জামা কাপড় পরে, কতকগুলো করছে কিচির-মিচির, কতকগুলো বা মা-বাপের কথামত গির্জার গাম্ভীর্য জোর করে মুখে

মাখবার চেষ্টা করছে, মেয়েরা যেতে যেতে দোকানের শার্সীতে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে হ্যাটটা আধ ইঞ্চি এ-দিক ও-দিক করে নিচ্ছে, গ্রামভারী গাঁওবুড়োরা রবিবারের নেভিব্লু সুট পরে চলেছেন গিন্নীদের সঙ্গে ধীরে মন্থরে, আর সে সব অথর্ব বুড়ো-বুড়ী সপ্তাহের ছদিন ঘরে বসে কাটান তাঁরা পর্যন্ত চলেছেন লাঠিতে ভর করে নাতি-নাত্নীদের সঙ্গে, অথবা হুইল-চেয়ারে বসে ছেলে-ভাইপোর মোলায়েম ঠেলা খেয়ে খেয়ে—বাচ্চারা যেরকম-ধারা পেরেম্বুলেটরে করে হাওয়া খেতে বেরোয়। জোয়ানদের ভিতর গির্জায় যায় অপেক্ষাকৃত কম কিন্তু যারা তাদের মুখে ফুটে উঠেছে প্রশান্ত ভাব—এরা গির্জার কাছ থেকে এখনো অনেক কিছু আশা করে, ধর্ম এখনো তাদের কাছে লোকাচার হয়ে যায় নি।

দোকান-পাট বন্ধ। রাস্তার কারবারি ভিড় নেই। শহর গ্রাম শান্ত, নিস্তব্ধ। তাই শোনা যাচ্ছে গির্জার ঘণ্টা—জনপদ, হাটবাট, তরুলতা, ঘরবাড়ি সবই যেন গির্জার চুড়ো থেকে ঢেলে-দেওয়া শান্তির বারিতে অভিষিক্ত হয়ে যাচ্ছে।'

চাচা থামলেন। বোধ করি বার্লিনের কলরবের মাঝখানে রাইনের সে ছবির বর্ণনা তাঁর নিজের কাছেই অদ্ভুত শোনাল। খানিকটে ভেবে নিয়ে বললেন, 'কিন্তু এহ বাহ্য। ক্যাথলিক ধর্ম ক্রিশ্চানের দৈনন্দিন জীবনে কতটুকু ঠাঁই পেয়েছে জানিনে, কিন্তু গির্জার ভিতরে তার যে রূপ সে না দেখলে, না শুনলে বর্ণনা দিয়ে সে-জিনিস বোঝাবার উপায় নেই।

মানুষ তার হৃদয়, তার চিন্তাশক্তি, তার আশা-আকাঙ্খা, তার শোকনৈরাশ্য দিয়ে বিরাট ব্রহ্মকে আপন করে নিয়ে কত রূপে দেখেছে তার কি সীমা-সংখ্যা আছে? ইহুদিরা দেখেছে য়েহোভাকে তাঁর রুদ্ররূপে, পারসিক দেখেছে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের প্রতীকরূপে, ইরানি সুফী তাঁকে দেখেছে প্রিয়ারূপে, মরমিয়া বৈষ্ণব তাঁকে দেখেছে কখনও কৃষ্ণরূপে কখনও রাধারূপে আর ক্যাথলিক তাঁকে দেখেছে মা-মেরির জননীরূপে।

তাই মা-মেরির দেবী-মূর্তি লক্ষ লক্ষ নরনারীর চোখের জল দিয়ে গড়া। আর্ত পিপাসার্ত বেদনাতুর হিয়া যখন পৃথিবীর কোনোখানে আর কোনো সান্ত্বনার সন্ধান পায় না, তখন তার শেষ ভরসা মা-মেরির শুভ্র কোল। যে মা-মেরি আপন দেহজাত সন্তান কণ্টকমুকুটশির যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পলে পলে ময়তে দেখলেন তাঁর সামনে, তিনি কি এই হতভাগ্য কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়-বেদনা বুঝতে পারবেন না? নশ্বর দেহ ত্যাগ করে তিনি আজ বসে আছেন দিব্য সিংহাসনে—তাঁর অদেয় কিছুই নেই, মানুষের অশ্রুবারি সপ্তসিন্ধু হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে হানা দিলেও তিনি সে-সপ্তসিন্ধু মুহূর্তের ভিতরেই কারাঙ্গুলি নির্দেশে শুকিয়ে দিতে পারেন। তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ক্যাথলিক গির্জায় গির্জায়।'

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণী জাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহীমাময়ী মা-মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

কত হাজার বার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। এই 'আভে-মারিয়া' উপাসনামন্ত্র খ্রীষ্টবৈরী ইহুদী সম্প্রদায়ের মেণ্ডেল্‌জোনকে পর্যন্ত যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তারই ফলে মেণ্ডেলজোন সুর দিয়েছেন মেরিমন্ত্রকে। ক্যাথলিকরা সেই সুরে মেরিমন্ত্র গেয়ে বিশ্বজননীকে আবাহন করে অষ্টকুলাচলশিরে, সপ্তসমুদ্রের পারে পারে।

কত লক্ষবার শুনেছি আমি এই প্রার্থনা। পুরুষের সবলকণ্ঠে, বৃদ্ধার অর্ধস্ফুট অনুনয়ে, শিশুর সরল উপসনায় মিলে গিয়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয় সে মন্ত্র তখন আর শুধু ক্যাথলিকদের নিজস্ব প্রার্থনা নয়, সে প্রার্থনায় সাড়া দেয় সর্ব আস্তিক, সর্ব নাস্তিক।

হঠাৎ মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে সমস্ত গির্জা ভরে ওঠে যন্ত্রধ্বনিতে। বিরাট অর্গান সুরের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছে গির্জার শেষ কোণ, ভিজিয়ে দিয়েছে পাপীর শুষ্কতম হৃদয়। উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে উপরের দিকে সে-গম্ভীর যন্ত্ররব, আর তার সঙ্গে গেয়ে ওঠে সমস্ত গির্জা সম্মিলিত কণ্ঠে,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।'

সেই ঊর্ধ্বদিকে উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত সঙ্গীতের প্রতীক ঊর্ধ্বশির ক্যাথলিক গির্জা। মানুষের যে-প্রার্থনা যে-বন্দনা অহরহ মা-মেরির শুভ্রকোলের সন্ধানে ঊর্ধ্বপানে ধায় তারই প্রতীক হয়ে গির্জাঘর তার মাথা তুলেছে ঊর্ধ্বদিকে। লক্ষ লক্ষ গির্জার লক্ষ লক্ষ শিখর মা-মেরির দিব্যসিংহাসনের পার্থিব স্তম্ভ।'

চাচা চোখ বন্ধ করে কি যেন ভাবলেন। তার পরে চোখ মেলে গোঁসাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গোঁসাই, রবিঠাকুরের সেই গানটা গাও তো,

'বরিষ ধারার মাঝে শান্তির বারি
শুষ্ক হৃদয় লয়ে আছে দাঁড়াইয়ে
ঊর্ধ্বমুখে নরনারী।'

গোঁসাই গুন্‌গুন্ করে গান গাইলেন। শেষ হলে চাচা বললেন, 'গির্জার ক্যাথলিক ধর্মসঙ্গীত তোমরাও শুনেছ কিন্তু তার করুণ দিকটা কখন লক্ষ্য করেছ কি না জানিনে।'

একদিন যখন আমি এই 'আভে মারিয়া' সঙ্গীতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চিলের মত উপরের দিকে উঠে যাচ্ছি—বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই—তখন হঠাৎ শুনি আমার পাশে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না। চেয়ে দেখি একটি মেয়ে চোখের জলে প্রেয়ার-বুক রাখার হাইবেঞ্চ আর তার পায়ের কাছে খানিকটে জায়গা ভিজিয়ে দিয়েছে। 'অর্গান আর

পাঁচশ' গলার তলায় লুকিয়ে লুকিয়ে মেয়েটি আপন কান্না কেঁদে নিচ্ছে।

পুর্ব-বাঙ্গলার ভাটিয়ালি গানে আছে রাধা ভেজাকাঠ জ্বালিয়ে ধুঁয়ো বানিয়ে কৃষ্ণ-বিরহের কান্না কাঁদতেন। শাশুড়ী ননদী জিজ্ঞেস করলে বলতেন, ধুঁয়ো চোখে ঢুকেছে বলে চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। শুনেছি বাঙ্গালী মেয়েও নাকি নির্জনে কাঁদবার ঠাঁই না পেলে স্নানের ঘরে কল ছেড়ে দিয়ে তার সঙ্গে হাউ হাউ করে কাঁদে।

গির্জায় মেয়েটির কান্না দেখে আমি জীবনে প্রথম বুঝতে পারলুম, রাধার কান্না, বাঙ্গালী মেয়ের কান্না কত নিরন্ধ্র অসহায়তা থেকে ফেটে বেরোয়।

তখন বুঝতে পারলুম, গির্জা থেকে বেরবার সময় যে অনেক সময় দেখেছি এখানে ওখানে জলের পোঁচসে ছাতার জল নয়, মেঝে ধোওয়ার জলও নয়, সে জল চোখের জল।

কুরান শরীফে আছে কুমারী মরীয়ম (মেরি) যখন গর্ভযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়লেন তখন লোকচক্ষুর অগোচরে গিয়ে খেজুর গাছ জড়িয়ে ধরে তিনি লজ্জায় দুঃখে আর্তনাদ করেছিলেন, ইয়া লায়তানি, মিত্তু কবলা হাজা—হায়, এর আগে আমি মরে গেলুম না কেন? মানুষের চোখের থেকে মন থেকে তাহলে আমি নিস্তার পেতুম।'

লোকচক্ষুর অগোচরে যাবারও যাদের স্থান নেই তাদের জন্য ভিজে কাঠের ধুঁয়ো আর স্নানের ঘরের কল খুলে দেওয়া।

তাই সর্ব অসহায় সর্ব বিপন্না নরনারীর চোখের জল মুক্তার হার হয়ে দুলছে মা-মেরির গলায়, তারই নাম 'আভে মারিয়া' মন্ত্র—'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী।'

গোঁসাই ভাল কীর্তন গাইতে পারেন; সহজেই কাতর হয়ে পড়েন। বললেন, 'চাচা, আর না।'

চাচা বললেন, 'মেয়েটিকে চিনতে পারলুম। কার্লকে এক্সরে করাতে গিয়ে ডাক্তারের ওয়েটিংরুমে মেয়েটির মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। ভদ্রহিলা মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন একই উদ্দেশ্যে। এরও যক্ষ্মা। তবে কি নিরাময় হবার জন্য কাঁদছিল? কে জানে?

চাচা বললেন, 'তারপর এক মাস হয়ে গিয়েছে, এমন সময় নাস্তিক উইলির সঙ্গে রাস্তায় দেখা। আমার গির্জা যাওয়া সে হামেশাই হাসি-মস্করা করত, কিন্তু ক্যাথলিক ধর্মের মূল তত্ত্ব তার অজানা ছিল না। উইলি 'মুক্তপুরুষ' কিন্তু আর পাঁচজনের জন্য যে ধর্মের প্রয়োজন সে কথা সে মানত। আমায় জিজ্ঞেস করল আমি যুডাস টাডেয়াসের তীর্থে যাবার সময় তার মাসীমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারব কি না? আমি শুধালুম যুডাস টাডেয়াস তীর্থ সাপ না ব্যাঙ তার কোনো খবরই যখন আমার জানা নেই তখন সে তীর্থে আমার যাবার কোনো কথাই ওঠে না। শুনে উইলি যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল,

'সে কি হে, টাডেয়াস তীর্থের নাম শোনো নি আর ক্যাথলিকদের সঙ্গে তোমার দহরম-মহরম।'

তারপর উইলি আমায় সালঙ্কারে বুঝিয়ে দিল, রাইন-নদীর ওপারে হাইস্টারবাখার রোট। সেখান থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে টাডেয়াস তীর্থ। সে তীর্থের দেবতা বল, পীর বল, বড়কর্তা হচ্ছেন সেন্ট যুডাস টাডেয়াস। বড় জাগ্রত পীর। ভক্তিভরে ডাকলে পরীক্ষা তো নিশ্চিত পাস হবে, যথেষ্ট ভক্তি থাকলে জলপানিও পেত পার। আর যদি মেয়েছেলে ঠাকুরকে ডাকে তবে সে নির্ঘাত বর পাবে—আশী বছরের বুড়ীর পক্ষে বাইশ বছরের বর পাওয়াও নাকি ঠাকুরের কৃপায় সসিজ্-বিয়ার (অর্থাৎ ডালভাত)।

বুঝলুম ঠাকুর খাসা বন্দোবস্ত করেছেন। নদীর এ-পারের বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোকরারা যাবে তাঁর কাছে পরীক্ষা পাসের লোভে, মেয়েরা যাবে বরের লোভে—দু' দলে তীর্থে দেখা হবে।তারপর কন্দর্প ঠাকুর তো রয়েছেনই টাডেয়াস্ ঠাকুরের সহকর্মী হয়ে স্বর্গের একসিকিউটিভ কমিটিতে। অর্থাৎ এ তীর্থে যেতে যে মেয়ে পশ্চাৎপদ নয় তার কপালে সপ্তপদী আছেই আছে। উইলি পইপই করে বুঝিয়ে দিল, তীর্থ না করে ক্যাথলিক ধর্মের মূলতত্ত্বে কেউ কখনো প্রবেশ করতে পারে নি—উইলির নিজস্ব ভাষায় বলতে গেলে, ক্যাথলিক ধর্ম যে কতটা কুসংস্কারে নিমজ্জিত তা তীর্থে না গিয়ে বোঝা যায় না। যীশুর ক্রস নিয়ে মাতামাতি, পোপকে বাবাঠাকুর বলে কলুর বলদের মত ঠুলি পরে তাঁর চতুর্দিকে ঘোরা তীর্থযাত্রার কুসংস্কারের কাছে নস্যি। তাহলে তো যেতে হয়।

পাড়ার পাদ্রীসায়েবকে যখন আমার সুমতির খবর দিলুম তখন তিনি কিছুমাত্র আশ্চর্য হলেন না। মনে হল, আমার যখন ধর্মে এত অচলা ভক্তি তখন যে আমি জব্বর পরবটাতে গরহাজির থাকব না তা তিনি আগের থেকেই ধরে নিয়েছিলেন।

গডেসবের্গ থেকে আমরা জন তিরিশেক দল বেঁধে পাদ্রীসায়েবের নেতৃত্বে ট্রাম ধরে বন্ পৌছলুম। বেরবার সময় ক্যার্লের মা আমার হাতে তুলে দিলেন প্রেয়ার-বুক বা উপাসনা-পুস্তিকা আর এক গাছা রোজারি বা জপ-মালা। বন্ পৌছে দেখি সেখানেই তীর্থের ঝামেলা লেগে গিয়েছে। এক গোডেসবের্গেরই বিস্তর চেনা-অচেনা লোককে দেখতে পেলুম। এক আশী বছরের বুড়ীকে দেখে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলুম—আমার বয়স বাইশ। হয়ত উইলি ভুল বলে নি। পালাই পালাই করছি এমন সময় পাদ্রীসায়েব আমাকে জোর করে বসিয়ে দিলেন সেই যক্ষ্মারোগিণী আর তার মায়ের কাছে। মেয়েটির সঙ্গে আলাপও হল—ভুল বললুম, পরিচয় হল, কারণ সামান্যতম সৌজন্যের মৃদুহাস্য বা অভ্যর্থনা পর্যন্ত সে করল না।

উইলির মাসী ইত্যিমধ্যে না-পাত্তা। খবর নিয়ে শুনলুম, পীরের দর্গায় জ্বালাবার জন্য মোমবাতি কিনতে গিয়েছেন। সে কি কথা? বিলিতী পীরের খাসা ইলেকটিরি

রয়েছে, মোমবাতির কি প্রয়োজন? আমাদের না হয় সাপের দেশ, বিজলি-বাতিও নেই—পিদিম মশাল না হ'লে পীরের অসুবিধা হয়। উইলি ঠিকই বলেছে, ধর্ম মাত্রই মোমবাতির আধা-আলোর কুসংস্কারে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পছন্দ করে, বিজলির কড়া আলোতে আত্মপ্রকাশ করতে চায় না।

মাসীর আবার কড়া নজর। মোমবাতি কেনার ঠেলাঠেলিতেও আমার উপর চোখ রেখেছেন জিজ্ঞেস করলেন, গ্রেটের সঙ্গে কি করে পরিচয় হল। তার পর মাসী যা বললেন তার থেকে গ্রেটের কান্নার অর্থ পরিষ্কার হল। গোঁসাইয়ের পদাবলীতে খণ্ডিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, বিপ্রলব্ধ নামের নানা নায়িকার পরিচয় আছে, এ বেচারী তার একটাতেও পড়ে না। এ মেয়ে বাল্যবিধবার চেয়েও হতভাগিনী, এর বল্লভ হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যায়। পরে খবর পাওয়া গেল পয়সার লোভে অন্যত্র বিয়ে করার জন্য গ্রেটেকে সে বর্জন করেছে। বাল্যবিধবার অন্তত এটুকু সান্ত্বনা থাকে, তার প্রেম অবমানিত হয় নি।

মাসী বললেন, 'কিন্তু আশ্চর্য, পুরো দু' বৎসর আমরা কেউ বুঝতে পারি নি গ্রেটের প্রাণে কতটা বেজেছে। মেয়েটা চিরকালই হাসি-তামাশা করে সময় কাটাত—দু' বছর তাতে কোনো হেরফের হল না। তারপর হ'ল যক্ষ্মা। তখন বোঝা গেল, যে আপেলের ভিতরে পোকা সে আপেলটারই বাইরের রঙের বাহার বেশী।'

চাচা বললেন, 'আমি বাঙাল দেশের লোক। যা-তা নদী আমার চোখে চটক লাগাতে পারে না। তবু স্বীকার করি, রাইন নদী কিছু ফেলনা নয়। দু' দিকে পাহাড়, আর মাঝখান দিয়ে রাইন সুন্দরী নেচে নেচে চলে যাবার সময় দু' পাড়ে যেন দু' খানা শাড়ি শুকোবার জন্য বিছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। সে শাড়ি দু' খানা আবার খাঁটি বেনারসী। হেথায় লাল ফুলের কেয়ারী হোথায় নীল সরোবরের ঝলমলানি, যেন পাকা হাতের জরির কাজ।

আর সেই শাড়ির উপর দিয়ে আমাদের ট্রাম যেন দুষ্টু ছেলেটার মত কারো মানা না শুনে ছুটে চলেছে। মেঘলা দিনের আলোছায়া সবুজ শাড়িতে সাদা-কালোর আল্পনা এঁকে দিচ্ছে আর তার ভিতর চাঁপা রঙের ট্রামের আসা-যাওয়া—সমস্ত ব্যাপারটা যেন বাস্তব বলে মনে হয় না; মনে হয় হঠাৎ কখন রাইন সুন্দরীর ধমকে দুষ্টু ছেলেগুলো পালাবে, আর সুন্দরী তাঁর শাড়িখানা গুটিয়ে নিয়ে সবুজের লীলাখেলা ঘুচিয়ে দেবেন।'

কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হলুম মোকামে পৌঁছে, ট্রাম থেকে নেমে সেখানে রাইনের দিকে তাকিয়ে দেখি রাইনের বুকের উপর ফুটে উঠেছে দুটি ছোট ছোট পল্লবঘন দ্বীপ। তার পেলব সৌন্দর্য আমার মনে যে তুলনাটি এনে দিল, নিতান্ত বেরসিকের মনেও সেই তুলনাটিই আসত। তাই সেটা আর বলছি না—সর্বজনগ্রাহ্য তুলনা রসিয়ে বলতে পারেন যিনি যথার্থ গুণী—শিপ্রাবল্লভ কালিদাস এ একম একজোড়া দ্বীপ দেখতে

পেলে মেঘদূতকে আর অলকায় পাঠাতেন না, এইখানেই শেষবর্ষণ করতে উপদেশ দিতেন।'

লেডি-কিলার পুলিন সরকার কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সূয্যি রায়ের ধমক খেয়ে চুপ করে গেল।

চাচা বললেন, 'হাইস্টারবারখার রোট থেকে টাডেয়াস্ তীর্থ আধ মাইল দূরে। এই পথটুকু নির্মাণ করা হয়েছে জেরুজালেমের 'ভিয়া ডলোরেসা' বা 'বেদনা-পথের' অনুকরণে। খ্রীষ্টের প্রাণদণ্ডের আদেশ জেরুজালেমের যে-ঘরে হয় সেখান থেকে তাঁর কাঁধে ভারি ক্রস্ চাপিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তাঁকে ক্রসের সঙ্গে পেরেক পুঁতে মারা হয়। এ পথটুকুর নাম 'ভিয়া ডলোরেসা'। ক্যাথলিক মাত্রেরই আশা, জীবনে যেন অন্তত একবার সে ঐ পথ বেয়ে ক্রুসভূমিতে উপস্থিত হতে পারে—যেখানে প্রভু যীশু সর্বযুগের বিশ্বমানবের সর্বপাপ স্কন্ধে নিয়ে কণ্টকমুকুটশিরে আপন রক্তমোক্ষণ নিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছেন।

কিন্তু জেরুজালেম যাওয়ার সৌভাগ্য বেশী ক্যাথলিকের হবে না বলেই তার অনুকরণে ক্যাথলিক জগতে সর্বত্র 'বেদনা-পথ' বানানো হয়। জেরুজালেমে এ পথের যেখানে শুরু তাকে বলা হয় প্রথম স্টেশন (পুণ্যভূমি) আর ক্রুসভূমিতে চতুর্দশ স্টেশন। এখানে তারই অনুকরণে চৌদ্দটি স্টেশনের প্রথমটি হাইস্টারবাখার রোটের কাছে আর শেষটা টাডেয়াস্ তীর্থের গির্জার ভিতরে।'

চাচা বললেন, 'হাইস্টরবাখার রোটে সেদিন রাইনল্যাণ্ডের বহু দূরের জায়গা থেকে বিস্তর লোক এসে জড় হয়েছে, এখান থেকে পায়ে হেঁটে ট্যাডেয়াস্ তীর্থে যাবে বলে। ছোট রেস্তোরাঁখানাতে বসবার জায়গা নেই দেখে আমি গাছতলায় বসে পড়েছি—গ্রেটে আর তার মা কোনো গতিকে দুটো চেয়ার পেয়ে বেঁচে গেছেন। হঠাৎ দেখি আমাদের পাদ্রীসায়েব গডেসবোর্গের যাত্রীদলের তদারক করতে করতে আমার কাছে এসে হাজির। ভদ্রলোক একটু নার্ভাস টাইপের—অর্থাৎ সমস্তক্ষণ হন্তদন্ত, কিছু একটা উনিশ-বিশ হলেই কপাল দিয়ে ঘাম বেরিয়ে যায়।

ধপ করে আমার পাশে বসে পড়লেন। আমি খানিকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করলুম, 'এই দুর্বল শরীর নিয়ে গ্রেটের তীর্থযাত্রায় বেরনো কি ঠিক হল?'

পাদ্রীসায়েবের মাথায় ঘাম দেখা দিল। রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন, 'জানেন মা-মেরি; গ্রেটের মায়ের শেষ আশা যদি টাডেয়াসের দয়া হয় আর তার বর জোটে। ঐ তো একমাত্র পন্থা পুরোনো প্রেম ভোলবার। তা না হলে ও-মেয়ে তো বাঁচবে না।' পাদ্রীসায়েব চোখ বন্ধ করে মা-মেরির স্মরণে উপাসনা করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী'!

জিরিয়েজুরিয়ে আমরাও শেষটায় রওয়ানা দিলুম তীর্থের দিকে। লম্বা লাইন—

সকলের হাতে উপাসনাপুস্তিকা আর জপমালা। পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, 'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা করুণাময়ী' আর যাত্রীদল বারবার ঘুরে ফিরে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করে সর্বশেষে ভক্তিভরে বলে,

'এই পাপীতপীদের দয়া কর, আর দয়া কর যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চুতর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।'

তারপর আমরা এক একটা করে সেই সব স্টেশন (পূণ্যভূমি) পেরতে লাগলুম। কোনটাতে পাদ্রীসায়েব চেঁচিয়ে বলেন, 'হে প্রভু, এখানে এসে ক্রসের ভার সইতে না পেরে তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলে,' আর সমস্ত তীর্থযাত্রী করুণা কণ্ঠে বলে ওঠে, 'হে প্রভু, 'তোমার লুটিয়ে পড়াতেই আমাদের পরিত্রাণ হল।' কোনো পূণ্যভূমির সামনে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হল তোমার জননী মা–মেরির। দূর থেকে তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনেছেন তোমার মৃত্যুদণ্ডাদেশ। এবার তিনি তোমার কাছে আসতে পেরেছেন কিন্তু কথা কইবার অনুমতি পান নি। তোমার দিকে তিনি তাকালেন—সে তাকানোতে কী পুঞ্জীভূত বেদনা কী নিদারুণ আতুরতা।' যাত্রীদল এককণ্ঠে বলে উঠল, 'মৃত্যুর চেয়েও ভালবাসা অসীম শক্তির আধার—স্টার্ক বী ডের টোট্ ইস্‌টডী লীবে।' কোনো পূণ্যভূমিতে পাদ্রীসায়েব বলেন, 'এখানে তাপসী ভেরোনিকা তাঁকে বস্ত্রখণ্ড এগিয়ে দিলেন, যীশু মুখ মুছলেন, আর কাপড়ে তাঁর মুখের ছবি ফুটে উঠল।' যাত্রীদল বলে, 'আমাদের হৃদয়ের উপর, হে প্রভু, তুমি সেই রকম ছবি এঁকে দাও।'

যাত্রীদল ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে আর প্রতি পুণ্যভূমির সামনে সবাই হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করে। পাদ্রীসায়েব পুন্যভূমির স্মরণে চিৎকার করে তার বর্ণনা পড়েন, যাত্রীদল নম্রকণ্ঠে সেই ঘটনাকে প্রতীক করে প্রাণের ভিতর তার গভীর অর্থ ভরে নেবার চেষ্টা করে।

বনের ভিতর ঢুকলাম। দু'দিকে উঁচু পাইন গাছ ঠায় দাঁড়িয়ে। আমরা যেন মহাভাগ্যবান নাগরিকদল চলেছি রাজরাজেন্দ্র দর্শনে, আর এরা হতভাগ্যের দল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পল্লব দুলিয়ে কপালে করাঘাত করছে, না এরা চামরব্যজন করে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে? প্রার্থনার মৃদু গুঞ্জরণ মিশে গিয়েছে পাইন পল্লবের মর্মরের সঙ্গে আর জমে–ওঠা শুকনো পাইন পাতার গন্ধ মিশে গিয়েছে যাত্রীদলের হাতের ধুপাধারের গন্ধের সঙ্গে।

খ্রীষ্ট আর মা–মেরির বেদনাকে কেন্দ্র করে এই যাত্রীদল, বিশ্বসংসারের তাবৎ ক্যাথলিক আপন দুঃখ–কষ্টের সান্ত্বনা খোঁজে, দুর্বলতার আশ্রয় খোঁজে, আপন নির্ভরের সন্ধান করে। রাধার বিরহবেদনায় বৈষ্ণব সাধু ভগবানকে না–পাওয়ার হাহাকার শুনতে পায়; সুফী সাধকের কান্নার গানও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে প্রিয়াবিরহের বেদনাকে কেন্দ্র

করে।

চাচা বললেন, 'গ্রেটের দিকে আমি মাত্র একবার তাকিয়েছিলুম অতি কষ্টে, সাহস সঞ্চয় করে। দেখি, সে চোখ বন্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলেছে, তার মা তার হাত ধরে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছে।'

চাচা বললেন, 'আমার ভক্তি কম। তাই বোধ হয় আড়নয়নে মাঝে মাঝে দেখে নিচ্ছিলুম দুপুর বেলাকার সাদা মেঘ অপরাহ্নের শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন কালো কালো ওভার-কোট পরতে আরম্ভ করেছে। দশম কি একাদশ পুণ্যভূমির সামনে হঠাৎ জোর হাওয়া বইতে আরম্ভ করল আর সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি—জর্মনে যাকে বলে 'বল্কেনব্রুখ' অর্থাৎ মেঘ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। ছাতা-বরসাতী অল্প লোকেই সঙ্গে এনেছিল—এবার প্রাণ যায় আর কি! ভাগ্যিস সেখান থেকেই তীর্থযাত্রীদের জন্য যে-সব রেস্তেরাঁ তার প্রথমটা অতি কাছে পড়েছিল। তবু রেস্তোরাঁতে গিয়ে যখন ঢুকলুম তখন আমাদের অধিকাংই জবুথবু। পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে জড়িয়ে নিয়েছিলেন দু'খানা বরসাতী দিয়ে। তার মা ছাতা ধরেছিলেন আর পাদ্রীসায়েব গ্রেটেকে বুকের ভিতরে যেন গুঁজে নিয়ে রেস্তেরাঁয় ঢুকলেন। পাদ্রীদের শরীর তাগড়া—যীশুখ্রীষ্টের এত বড় গীর্জা যখন তাঁদের কাঁধের উপর থেকে পড়ে ভেঙে যায় নি তখন গ্রেটে তো তার কাছে চরকাকাটা বুড়ীর সূতো।

'রথ দেখা আর কলা-বেচা' না কচু। তাতে হয় ধর্ম আর অর্থ। কিন্তু যদি বলা হত 'রথ দেখা আর প্রিয়ার কণ্ঠালিঙ্গন' তাহলে হয় ধর্ম আর কাম, আর তাতেই আছে আসল মোক্ষ। রেস্তোরাঁয় ঢুকে তত্ত্বটা মালুম হল।

রেস্তোরাঁ এতই বিশাল যে সেটাকে নৃত্যশালা বলাই উচিত। দেখি শ'খানেক ছোঁড়াছুঁড়ি, বুড়োবুড়ী ধেই ধেই করে নাচছে, বিয়ারের ফোয়ারা বইছে আর শ্যাম্পেনে শ্যাম্পেনে ছয়লাপ।আর সবাই তখন এমনই মৌজে যে আমাদের দল ভিজে কাকের মত ঢুকতেই চিৎকার করে সবাই অভিনন্দন জানাল। ধাক্কাধাক্কি ঠাসাঠাসি করে আমাদের জন্য জায়গা করে দেওয়া হল, গায়ে পড়ে আমাদের জন্য পানীয় কেনা হল, আহা, আমরা যেন সব লঙ লস্ট ব্রাদার্স—বহুদিনের হারিয়ে-যাওয়া ফিরিয়ে-পাওয়া ভাই।

এতে চাটবার কি আছে, বল? ধর্মকর্ম করতে গেলেই যে মুখ গুমশো করে সব কিছু করতে হবে সে কথা লেখে ধর্মবিধির কোন্ ধারায়? এমন কি আদালতেও দেখো নি যেখানে খুনের মোকাদ্দমা হচ্ছে সেখানেও জজ-ব্যারিস্টাররা ঠাট্টামস্করা করেন।

গ্রেটের মা, গ্রেটে, পাদ্রীসায়েব আর আমি একখানা টেবিল পেয়ে গেলুম জানালার কাছে।বাইরে তখন বৃষ্টি আর ঝড়, আর জানালার খড়খড়ানি থেকে বুঝতে পারছি ঝড় বেড়েই যাচ্ছে, বিদ্যুতের আলোতে দেখলুম রাস্তা জনমানবহীন, এক হাঁটু জল জমে

গিয়েছে।

তাতে কার কি এসে যায়। গান ফুর্তি তো চলেছে। 'ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক, ট্রিঙ্ক ব্র্যাডারলাইন--পিয়ো, পিয়ো বঁধুয়া, পিয়ো আরবার' শতকণ্ঠে গান উঠছে, পিয়ো পিয়ো বঁধুয়া। এরা সব গান গাইতে পারে ভালো,—গির্জেয় এদের ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার অভ্যাস আছে। যে শিবলিঙ পুজোর জন্য দেবতা হন তাঁকে দিয়ে মশারির পেরেক ঠুকলে তিনি কি আর গোসা করে বাড়িঘরদোর পুড়িয়ে দেন? রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, 'আমাদেরই বাগানের ফুল কেহ দেয় দেবতারে, কেহ প্রিয়জনে।' দু'জনকে দিতেও তিনি আপত্তি করতেন না নিশ্চয়ই।

পাদ্রীসায়ের আমাকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে যেতে লাগলেন। আমাদের তিনমাসের পরিচয়ের মধ্যে একদিন একবারের তরেও তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল দেখান নি। আজ এই শরাবখানায় হঠাৎ যে কেন তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা বেড়ে গেল বুঝতে পারলুম না। দরদী মানুষ; গ্রেটের মন ভোলাবার জন্য সব কিছু করতেই রাজী আছেন। আমিও কলকাতাতে যে হাতী-ট্যাক্সি পাওয়া যায় এবং তার ভাড়া দিতে হয় হাতীকে কলা খাইয়ে, সে-কথা বলতে ভুললুম না। বোধ করি গ্রেটেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমার সম্মান রাখার জন্য দু'একবার হেসেছিল। একবার আমায় জিজ্ঞেসও করল আমি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে কি কি পড়েছি? আমি অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলুম সে কিছু পড়েছে কিনা। ততক্ষণে তার মন আবার অন্য কোনো দিকে চলে গিয়েছে। দু'বার জিজ্ঞেস করার পর শুধু বলল 'হুঁ'। বুঝলুম হতভাগিনী শান্তির সন্ধানে অনেক দুয়ারেই মাথা কুটেছে।

সেখানেই ডিনার খাওয়া হল। এ জলঝড়ে তীর্থ মাথায় থাকুন, বাড়ি ফেরার কথাই কেউ তুললো না। শেষ ট্রাম ছাড়ে দশটায়। রাত তখন এগারোটা।

হঠাৎ গ্রেটে পাদ্রীসায়েবকে শুধাল, 'কটা বেজেছে?'

পাদ্রীসায়েব একেই নার্ভাস লোক তার উপর এই জলঝড়ে তাঁর সব কিছু ঘুলিয়ে গিয়েছিল।দশ মিনিট পর পর জানালা দিয়ে দেখছিলেন বৃষ্টি কমবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কিনা—আমি প্রতিবারেই ভেবেছি তীর্থযাত্রীর শেষরক্ষা করার জন্য সায়েবের এই ছটফটানি।

গ্রেটের প্রশ্ন শুনে তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে দরজা খুলে সেই ঝড়ের মাঝখানে বেরিয়ে পড়লেন। আমি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের আলোকে দেখলুম, বাতাসের ঠেলায় পাইন গাছগুলো কাত হয়ে এ ওর গায়ে মাথা কুটছে, আর পাদ্রীসায়েব কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে কোনো অজানার সন্ধানে চলেছেন।

আমি ফের টেবিলে এসে বসলুম। মা মেয়ে দু'জনই চুপ। আমার মুখ দিয়েও কোনো কথা বেরুচ্ছিল না।

এ ভাবে কতক্ষণ কাটল জানিনে। ঘণ্টাখানেক হতে পারে—অল্পবিস্তর এদিক ওদিক। পাদ্রীসায়েব ফিরে এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের একটি লোম পর্যন্ত শুকনো নয়।বললেন, 'জলঝড়ের জন্য কাউকে খুঁজে পেলুম না, গির্জে বন্ধ করে সবাই চলে গিয়েছে। আর এ জলে তুমি যেতেই বা কি করে?'

পাদ্রীসায়েব আরো কি যেন বলছিলেন, টাডেয়াসকে সব জায়গা থেকেই স্মরণ করা যায়, তিনি অন্তর্যামী এরকম ধারা কিছু, কিন্তু তাঁর কথার মাঝখানে হঠাৎ গ্রেটে উঠে দাঁড়াল। জলঝড়ের ভিতর দিয়েও শব্দ এল গির্জার বারোটার ঘণ্টা। গ্রেটে শুনতে পেয়েছে, মন দিয়ে শুনেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা, তোমাকে তখনই বলেছিলুম, আমি আসব না। তবু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে এলে। ঐ শুনলে বারোটা বাজার ঘণ্টা? পরব শেষ হল। য়ুডাস টাডেয়াস্ আমাকে তাঁর তীর্থে যেতে দিলেন না তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। আমি জানতুম, আমি জানতুম এ রকমই হবে। এখন আমি কোথায় যাবো গো, মাগো, হে মা-মেরি—'

গ্রেটের গলা থেকে ঘড়ঘড় করে কি রকম একটা অদ্ভুত শব্দ বেরল। পাদ্রীসায়েব জড়িয়ে না ধরলে সে পড়ে যেত।

চাচা থামলে পর অনেকক্ষণ ধরে কেউ কিছু বলল না। শেষটায় বয়সে সকলের ছোট গোলাম মৌলা জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটার আর কোনো খবর নেন নি?'

চাচা বললেন, 'না, তবে মাস দুই পরে আরেকদিন গির্জায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নায় শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি গ্রেটের মা। পরনে কালো পোশাক।'

For More Books visit www.murchona.com
Murchona Forum : http://www.murchona.com/forum/index.php